হিন্দুস্তান

ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে

সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি

ইমতিয়াজ বুরহান
অনূদিত

বাতায়ন
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে সমৃদ্ধ হিন্দুস্তান - ১০
ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে হিন্দুস্তানের আর্থিক অবস্থা - ১৪
সম্রাট আকবরের শাসনামলে স্বর্ণমুদ্রা ওজনের একটি তালিকা - ১৭
সম্রাট আকবরের শাসনামলে হিন্দুস্তানে নিচের মুদ্রাগুলো প্রচলিত ছিল - ১৭
বাদশাহ জাহাঙ্গিরের শাসনামলে রৌপ্যমুদ্রার মান ও তাদের ওজন নিম্নরূপ - ১৭
ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে ভারতের কৃষিব্যবস্থা - ২০
ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক অবস্থা - ২৬
ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে হিন্দুস্তানের চারিত্রিক অবস্থা - ৩৪
ব্রিটিশ কর্তৃক হিন্দুস্তানের শিক্ষাখাত ধ্বংসের উপাখ্যান - ৩৬
ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে হিন্দুস্তানের ধর্মীয় সহনশীলতা - ৩৮
সম্রাট বাবরের ওসিয়ত - ৪১
বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ফরমান - ৪২
ব্রিটিশ আগ্রাসনের পর বিধ্বস্ত হিন্দুস্তানের পটভূমি - ৪৬
হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ আগমনের পটভূমি - ৪৬
হিন্দুস্তানের আর্থিকখাত ধ্বংসের প্রেক্ষাপট - ৪৯
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তিন যুগ - ৫১
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৃতীয় যুগ - ৬৫
কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসের ইতিবৃত্ত - ৭৭
হিন্দুস্তানি জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির কারণ - ৮৪
ইংরেজদের হাতে হিন্দুস্তানের শিল্প ও ব্যবসায়িক ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস - ৯৩
হিন্দুস্তানের শিল্প ও ব্যবসা ধ্বংসের ডিপ্লোম্যাটিক পদ্ধতি - ৯৫
হিন্দুস্তানি শিল্প ধ্বংসের দ্বিতীয় মাধ্যম—নিরাপদ ব্যবসা পদ্ধতির বিস্তার - ১০২
হিন্দুস্তানের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের তৃতীয় পদ্ধতি ছিল ফ্রি-ট্রেড বা স্বাধীন ব্যবসা নীতি - ১১৫

হিন্দুস্তানের শিল্প-বাণিজ্য ও হস্তশিল্প ধ্বংসের পরিণাম - ১২৩
ব্রিটিশদের হাতে হিন্দুস্তানের চারিত্রিক ধ্বংসের ইতিবৃত্ত - ১২৫
চারিত্রিক অধঃপতনের কিছু কারণ - ১২৫
শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের ইতিবৃত্ত - ১৩৯
সাম্প্রদায়িকতার প্রচার-প্রসার - ১৪৬
সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি এবং ঘৃণার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করা - ১৪৬

ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে সমৃদ্ধ হিন্দুস্তান

হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে পুরো পৃথিবীব্যাপী হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। হিন্দুস্তানের বিশেষ এক আধিপত্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ছিল সে সময়। হিন্দুস্তানের অকল্পনীয় এ মর্যাদার পেছনে বেশকিছু কারণ জানা থাকলেও মূল কারণ হিসেবে আমরা ধরতে পারি, এখানকার আর্থিক সমৃদ্ধি ও উন্নতি-অগ্রগতির শ্রেষ্ঠত্ব। এখানকার শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, হেকমত-দর্শন, হিসাববিজ্ঞান পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল। হিন্দুস্তানের এ শিল্পবিপ্লব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে এশিয়া ও আফ্রিকা উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ দেশগুলোসহ আশপাশের অনেক রাষ্ট্রও সে সময় অনেক উপকৃত হয়েছিল। কারণ, একদিকে যেমন মুসলিম রাজা-বাদশারা এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলামি স্বভাব-চরিত্রের উন্নতি-অগ্রগতি ও দ্বীনি ইলম প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই বহির্বিশ্বের বড় বড় স্বনামধন্য স্কলার, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের ডেকে এনে সম্মানজনক বেতনের ব্যবস্থা করে তাদের ইলমি যোগ্যতা ও দ্বীনি পূর্ণতা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলিম রাজা-বাদশাদের ব্যাপক এ উদ্যোগের কারণেই পুরো হিন্দুস্তানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। বহির্বিশ্বের যেকোনো নাগরিককে, যেকোনো বংশের, যেকোনো গোত্রের মানুষকে এখানে সম্মানের চোখে দেখা হতো।

রাষ্ট্রপরিচালনা ও সরকারি অবকাঠামো দেখাশোনার সব দায়িত্ব সে সময় রাজা-বাদশাদের হাতেই ছিল। কিন্তু মাজহাব বা ধর্মীয় আদর্শের বৈপরীত্যের কারণে মুসলিম রাজা-বাদশারা কখনোই ভিন্ন মতাদর্শীর ওপর কোনো জুলুম-নির্যাতন করতেন না। গোত্রপ্রীতির কোনো নাম-নিশানাও সে সময় হিন্দুস্তানে ছিল না। পুরো পৃথিবীতে হিন্দুস্তানকে এক জাতি ও এক দেহের মতোই মনে করা হতো। মধ্যপ্রাচ্য ও আরববিশ্বের মুসলিম শাসকরা হিন্দুস্তানে নিজেদের আধিপত্য ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরও এখানে তারা আরব্য জাতীয়তাবাদ বা নিজ এলাকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, বংশীয় ঐতিহ্য প্রচার-প্রসারের চিন্তা-ভাবনা করেননি; বরং সাধারণ মুসলিমদের মতো তারাও এখানে বসবাস করেছেন। মনে হতো তারা হিন্দুস্তানেরই লোক! এখানকার অধিবাসীদের মতোই তারা সবার সাথে মিশে গিয়েছিলেন।

হিন্দুস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, যেসব মুসলিম শাসক হিন্দুস্তান জয় করেছিলেন তারা নিজ দেশ ও মাতৃভূমির টান, রক্তের সম্পর্ক অনেকটাই ছিন্ন করে ফেলেছিলেন এবং হিন্দুস্তানের সাথে এক চিরস্থায়ী বন্ধন তৈরি করেছিলেন। রাষ্ট্রপরিচালনা, শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ কিংবা আচার-আচরণে তারা হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন, যেমন একটি জাতি বা একটি পরিবার পরস্পর একে অন্যের মাঝে মিশে যায়।

তৎকালীন হিন্দুস্তানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রপরিচালনার ভিত্তি প্রজাদের সন্তুষ্টির ওপরই ছিল। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণ নিজেরাই বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারতেন। গ্রামপর্যায়ের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে রাজা-বাদশাহ সবারই আলাদা পরামর্শসভা, আলোচনাঘর ও বিশেষ দরবার ছিল। প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে মতামত ও রায় প্রকাশের অধিকার ছিল। হিন্দুস্থানের ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার বারটেল ফ্রেয়ার লিখেছেন—

> হিন্দুস্তানের সাধারণ একজন শাহজাদার বিচারালয় ও দরবার ব্রিটিশ ন্যাশনাল কাউন্সিলের মতোই ছিল। এখানকার ন্যায়বিচারক শাসকের কাছে সব ধরনের মানুষের আনাগোনা ছিল। স্বাধীনভাবে সবাই এখানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করত। এজন্য প্রজারা রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতির প্রভাব নিজেদের মাঝে অনুভব করত এবং আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে রাষ্ট্রীয় সকল আইন মেনে চলত। রাষ্ট্রের নতুন নিয়মনীতি জানার জন্যও তারা আগ্রহভরে অপেক্ষা করত।[১]

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, হিন্দুস্তানের ভিনদেশি শাসকরা এ দেশে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর এখানকার মানুষদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এখানকার বিধবা নারীদেরও বিয়ে করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদ থেকে সেনাবাহিনী, এমনকি গ্রাম-মহল্লা পর্যন্ত ছোটখাটো সব ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও সেনাকার্যক্রমে জাতি-ধর্ম-গোত্র-রঙ-বর্ণ-জাতীয়তা-নির্বিশেষে যোগ্যতানুযায়ী তারা বিজিত এলাকার মানুষদের রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগদান করতেন। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু প্রজাদেরও তারা রাজা-মহারাজা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাদের বড় বড় জায়গির প্রদান করেছিলেন। বড় বড় এলাকার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। অনেককে সাত হাজার জায়গিরদারি, ছয় হাজার জায়গিরদারি, পাঁচ হাজার জায়গিরদারিসহ আরও অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন।

স্যার পি.সি. রায় বলেন—

> বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে হিন্দুদের বড় বড় জায়গিরদারি দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে বড় বড় এলাকার শাসনভার দেওয়া হয়েছিল। এমনকি ধর্মীয় উদারতার পরিচয় দিতে গিয়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব হিন্দুদের নিজ রাজ্যের গভর্নর

---

[১]. আইনি ধারাসমূহের রিপোর্ট : মানিটগো জেমসফোর, পৃষ্ঠা-৩৮

পর্যন্ত বানিয়েছিলেন। নিজের ভাইসরয়ও বানিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বাদশাহ আওরঙ্গজেব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ আফগানিস্তানে যাকে নায়েবুস সালতানাত (বাদশাহর প্রতিনিধি) বানিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন একজন হিন্দু রাজপুত।[২]

রাষ্ট্রীয় কার্যালয়, রাজদরবার থেকে শুরু করে সাধারণ পর্যায়ের সব ধরনের অফিস-আদালতে হিন্দু-মুসলিম কর্মচারী সবাই একীভূত ছিলেন। বিধর্মীদের প্রতি কোমলতা ও মানসিক চিন্তা-চেতনার উদারতার কারণেই তৎকালীন পৃথিবীতে হিন্দুস্তান বিশ্ববাসীর চোখে পারস্পরিক সম্মান-সহযোগিতা এবং শক্তিমত্তার বিচারে অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ে ছিল। বিশ্ববাসীর চোখে সে সময় হিন্দুস্তানের আলাদা এক মর্যাদা ছিল। বরং বললে অত্যুক্তি হবে না, হিন্দুস্তান নিজের উপমাহীন ঐশ্বর্য, তুলনাহীন ব্যবসা, অসাধারণ হস্তশিল্প, বিস্ময়কর সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অকল্পনীয় শক্তিমত্তার কারণে সে সময় পৃথিবীব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন ছিল, শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিল। কোনো হিন্দুস্তানি নাগরিক; চাই সে যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, পৃথিবীর কোনো দেশে তাকে অসম্মানের চোখে দেখা হতো না। এমনকি হিন্দুস্তানের কোনো নাগরিককে বহিরাগত কারও অপমান করার স্পর্ধা ও দুঃসাহস ছিল না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বার্নির ফ্রান্সি বলেন—

> হিন্দুস্তানের রাজারা নিজ প্রজাদের এভাবে দেখাশোনা করতেন, যেভাবে বাদশারা নিজ পরিবারের লোকদের খোঁজখবর নিয়ে থাকেন। কখনো কোনোভাবেই সহ্য করা হতো না যে, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কোনো লোক অপরিচিত বা দুর্বল কোনো প্রজার ব্যাপারে নাক গলাবে বা তাদের ওপর জুলুম করবে।

হিন্দুস্তানের শ্রমজীবী কমিশন—যাদের প্রায় সবাই ইংরেজ বংশোদ্ভূত—নিজেদের এক রিপোর্টে লিখেছে—

এমন একটা সময়, পশ্চিম ইউরোপে—যেটা বর্তমান সময়ের হস্তশিল্প ও শিল্পবিপ্লবের জন্মভূমি—যখন অসভ্য উপজাতিদের বসবাস ছিল, ঠিক সে সময়টাতে হিন্দুস্তান নিজ শাসকদের নৈতিক উদারতা, বিশ্বস্ততা, সম্পদ ও সুদক্ষ কারিগরের উচ্চমার্গীয় শিল্পকলার বদৌলতে পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত ছিল। হিন্দুস্তানের এ অভাবনীয় উন্নতি-অগ্রগতির আরও অনেক পরে পশ্চিমা উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা হিন্দুস্তানে ব্যবসায়ী সেজে আবির্ভূত হয়েছিল। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এ দেশ কখনো, কোনো সময়, কোনোভাবেই উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলোর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।[৩]

স্যার থমাস মুনরো (ব্রিটিশদের দখলের আগে হিন্দুস্তানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে) বলেছেন—

হিন্দুস্তানের লোকদের মাঝে চাষপদ্ধতির সৃজনশীলতা, অতুলনীয় চারুকলা, হস্তশিল্পের কারুকাজ, শিল্প ও কৃষি বিষয়ে উচ্চমার্গীয় দক্ষতা, প্রতি পাড়া-মহল্লা ও গ্রামে স্কুলের

---

[২]. মুসলমানু কা রওশন মুস্তাকবিল, পৃষ্ঠা-১৪

[৩]. ইলমুল মায়েশাত, পৃষ্ঠা-৩৩

উপস্থিতি—যেখানে পড়ালেখা ও হিসাব-নিকাশ শেখানো হয়, প্রত্যেকের মাঝে আতিথেয়তা ও দানের পবিত্র-বরকতময় মনোভাব রয়েছে। সর্বোপরি একজন মানুষের মান-মর্যাদা, সম্মান ও পবিত্রতার ব্যাপারে হিন্দুস্তানে সবচেয়ে বেশি লক্ষ রাখা হয়। এগুলো এমন কিছু গুণ, যা ছাড়া আমরা একটি জাতিকে সভ্য, ভদ্র, সুশীল বা মর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি বলতে পারি না। এ ধরনের মানবিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গুণাবলির উপস্থিতির কারণে হিন্দুস্তানকে কখনো এবং কোনোভাবেই ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা যাবে না। ইংল্যান্ড ও হিন্দুস্তানের মধ্যে যদি সভ্যতা-সংস্কৃতির বাণিজ্য হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত, হিন্দুস্তান থেকে ইউরোপ-আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে যা-ই আমদানি করা হবে তাতেই ব্রিটিশদের অনেক লাভ ও উপকার হবে।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (ভারতের বিখ্যাত ভাইসরয় এবং মাদ্রাজের গভর্নর) ১৮৮২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ কমিটির সামনে একটি বিবৃতি দেওয়ার সময় বলেন—

> অনেক দিক থেকে ইসলামি সরকারগুলো ইংরেজ শাসনের চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন। মুসলমানরা যখন হিন্দুস্তান জয় করেন, তখন তারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন এবং এখানকার বাসিন্দাদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। এমনকি তারা এখানকার নারীদেরও বিয়ে করেন। আমি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মুসলমানরা ভারতীয় জাতিগুলোকে সব ধরনের অধিকার দিয়েছে। আমি দেখেছি, এখানকার বিজয়ী ও বিজিতের হাসি-আনন্দ, ঠাট্টা-রঙ-তামাশা একই রকম ছিল। হিন্দুস্তানে কোনো সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশদের নীতি ঠিক এর বিপরীত। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কারণে এখন সবখানে স্বার্থান্বেষিতা, উদাসীনতা ও আত্মদাম্ভিকতা বিরাজ করছে। ফলে একদিকে ইংরেজরা যেমন এ দেশের মানুষের ওপর লৌহ নখর বসিয়ে দিচ্ছে, তেমনই হিন্দুস্তানের জনসাধারণের প্রতিটি জিনিসের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে। অবস্থা এতটাই ভয়াবহ, ব্রিটিশদের জুলুম-অত্যাচার-নিপীড়ন ও শোষণ সহ্য করা ছাড়া এখানকার মানুষের আর কিছুই করার নেই।[৪]

পণ্ডিত সুন্দর লাল সাহেব তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিন্দুস্তানে ব্রিটিশদের আধিপত্য' বইয়ে লিখেছেন—

> বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান আরও পরে আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরি সবার যুগেই হিন্দু-মুসলমান সবাই সমান ছিল। মোঘল শাসনামলে হিন্দুত্ববাদ ও ইসলাম উভয় ধর্মকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ধর্মীয় স্বার্থে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। অসংখ্য হিন্দু প্রজা ও মন্দিরে জায়গির প্রদান করা হয়েছিল। তাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল।

[৪]. হিন্দুস্তান মে ইসাইউ কি হুকুমত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৪৬

ব্রিটিশ আগ্রাসনের পর বিধ্বস্ত হিন্দুস্তানের পটভূমি

হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ আগমনের পটভূমি

হিন্দুস্তানে ব্রিটিশদের আগমনের সংক্ষিপ্ত পটভূমি হলো, দৃঢ় মনোবল ও জাহাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছিল পর্তুগাল। অন্য কোনো জাতি তাদের সমকক্ষতার দাবিও করতে পারত না। সে হিসেবে হিন্দুস্তান এবং ইউরোপের মধ্যে সামুদ্রিক পথ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সকলেই সর্বপ্রথম পর্তুগিজদের শরণাপন্ন হয়। পর্তুগিজরা সমুদ্রপথে আফ্রিকা উপকূল থেকে সরাসরি সামনের দিকে পথচলা শুরু করে। দক্ষিণ দিকে পৌঁছে তারা ভারত মহাসাগরে এসে উপস্থিত হয়। বিখ্যাত পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন—যাকে আমরা ভাস্কো দা গামা নামে চিনি—কয়েকটি জাহাজ নিয়ে ১৪৪৮ সালে হিন্দুস্তানের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্র কিনারায় এসে উপস্থিত হন এবং কালিকট শহরে অবতরণ করেন। সেখানকার রাজাকে তখন ঝামুরান বলা হতো। তিনি ভাস্কো দা গামার কাছে পর্তুগালের রাজার নামে একটি চিঠি লিখে দেন। সেখানে তিনি লেখেন—

> আমার দেশে প্রচুর দারুচিনি, লং, কালো মরিচ ও আদা উৎপন্ন হয়। আমি এগুলোর বিনিময়ে আপনার দেশের সোনা-রুপা, হিরা-জহরত ও মূল্যবান জিনিসপত্র আমদানি করতে চাই।

ভাস্কো দা গামার এই সামুদ্রিক পথ আবিষ্কারের পরবর্তী ১০০ বছর অর্থাৎ, ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের সামগ্রিক ব্যবসা সম্পূর্ণ পর্তুগিজদের আয়ত্তে ছিল। তারা গোয়া নামক স্থানে একটি মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেছিল। এমনকি আজ পর্যন্ত সেই জায়গাটি পর্তুগিজদের দখলে রয়েছে। এদিকে ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা যখন দেখল, পর্তুগিজরা হিন্দুস্তানে ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছে, তাদের সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিজেদের দেশ ও শহরগুলোকে তারা জান্নাত বানিয়ে নিচ্ছে, লোভে তাদের জিভেও পানি চলে এলো। তারাও হিন্দুস্তানে ব্যবসা করার আগ্রহ দেখাল। তারা ভাবল, যেকোনো উপায়ে হোক আমাদেরও এ ব্যবসায় অংশগ্রহণ করা উচিত। সুতরাং হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইডেনের ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকেই হিন্দুস্তানে ব্যবসায়ী জাহাজ পাঠানো শুরু করল। কিন্তু এ ব্যবসায় শুধু হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও

হিন্দুস্তানের আর্থিকখাত ধ্বংসের প্রেক্ষাপট

ক্ষমতা দখল এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের নেশায় ব্রিটিশদের এ কথা স্মরণ রাখা বা স্বীকার করা অনেক কঠিন ছিল যে, কোনো একসময় হিন্দুস্তানের শাসক ও নবাবরা ইংল্যান্ড থেকে আগত নতুন ব্যবসায়ীদের ওপর সাম্প্রদায়িকতা ভুলে কতটা সহমর্মিতা দেখিয়েছেন, তাদের ওপর কী কী অনুগ্রহ করেছেন বা তাদের কত ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। পরবর্তী সময় এই মুখচোরা ব্যবসায়ীদের চালাকি ও অনুগ্রহ ভুলে যাওয়াটাই হিন্দুস্তানের নবাব ও শাসকদের জন্য ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যের ভালো চাওয়াটাই নিজেদের কঠিন পরিণতি ডেকে এনেছিল। যদিও ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে সচেনতভাবেই হিন্দুস্তানের ইতিহাসের এসব অধ্যায়ে গুরুত্ব সহকারে ও সতর্কতার সাথে পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে; যাতে এগুলো সকলের অগোচরে থেকে যায়; কিন্তু বিগত তিন শতাব্দীর ইতিহাস থেকে হিন্দুস্তানের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা, শাসকদের অপাত্রে সহমর্মিতাপ্রদান ও অযোগ্যদের ওপর ভরসার পরিণামে হিন্দুস্তানের দায়িত্বশীলরা নিজেরাই নিজেদের চোখ অন্ধ করে ফেলেছেন।[৫২]

মোটকথা, হিন্দুস্তানের বাদশাহ ও শাসকরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশদের যে অকল্পনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত হয়ে প্রশস্ত হৃদয়ে তাদের যেসব জিনিস দান করেছিলেন, তা আজ সভ্যতার দাবিদার ইউরোপের বিভিন্ন জাতি এবং মানবতার সেবকেরা—যারা উচ্চকণ্ঠে নিজেদের বাকস্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের কথা বলে—অপরিচিত কোনো লোক বা ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাথে কখনোই তারা এ রকম সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেনি। এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান তো দূরের কথা, হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের মানবিক অধিকারটুকু আদায়েও তারা কুণ্ঠাবোধ করেছে। হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকারটুকুও তারা দেয়নি।

লর্ড ক্লাইভ লেখেন—

মুর্শিদাবাদ শহরটি লন্ডনের মতোই সুপ্রশস্ত ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল; কিন্তু পার্থক্য এটাই, মুর্শিদাবাদ শহরে এমন অসংখ্য মানুষ ছিল, যারা সহায়-সম্পত্তির দিক থেকে

---

[৫২]. মায়েশাতুল হিন্দ, পৃষ্ঠা : ৩১৮

কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসের ইতিবৃত্ত

কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলোতেও ব্রিটিশদের পলিসি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও হৃদয় ব্যথিত করার মতো। ব্রিটিশ আধিপত্যের আগে কৃষকরা তাদের সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ ট্যাক্স হিসেবে আদায় করত। শীতের ফসল পরিপক্ক হওয়ার পর সম্রাটের পক্ষ থেকে অফিসাররা ফসল মাপত এবং উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক চার ভাগের এক ভাগ সরকারের কোষাগারে জমা দিত। ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলের চার ভাগের এক ভাগ বা তার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য নিয়ে নেওয়া হতো। সুতরাং ফসল ভালো হলে রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়ের জন্যই ভালো হতো। আর ক্ষতি হলে রাষ্ট্র-কৃষক উভয়ের ক্ষতি হতো।

মুসলিম শাসকদের শাসনামলে রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়েই লাভ-ক্ষতিতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখলের পর থেকেই কর আদায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলো। উৎপন্ন শস্য নেওয়ার পরিবর্তে নগদ রুপি নেওয়াকেই তারা প্রাধান্য দিলো। তাই ফসল ভালো হোক বা খারাপ, জমিনে কোনো ফসল হোক বা না হোক, সেটা তাদের দেখার বিষয় ছিল না। সর্বাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার জনগণ থেকে নির্ধারিত ট্যাক্স উসুল করত। এমনকি যদি জমিতে কোনো ফসল নাও হতো, তবুও জনগণকে নির্ধারিত ট্যাক্স আদায় করতে হতো। যদি কেউ ট্যাক্স আদায়ে অক্ষম হতো, তাহলে তার সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতো। তার ঘরের আসবাবপত্র, অলংকার এমনকি কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় মাধ্যম যেমন গরু, হাল ইত্যাদি সব কিছু নিলামে তোলা হতো। ফলে হিন্দুস্তানের কৃষকরা ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হলেন। শুধু এটাই না, ট্যাক্সের পরিমাণ দিন-দিন বাড়ছিল। লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার জিকার হার্ডিং নিজের বই 'ইন্ডিয়ায়'—যেটা ১৯০৯ সালে হিন্দুস্তানে প্রকাশিত হয়েছিল—লেখেন—

যেমনটা দাবি করা হয় যে, মোঘল সম্রাট বা অন্যান্য বাদশাদের যুগে এখানকার কৃষকদের যে কর আদায় করতে হয়, ইংরেজ শাসনামলে কৃষকদের তারচেয়ে অনেক কম ট্যাক্স আদায় করতে হতো—এই দাবি কয়েকভাবে খণ্ডন করা যেতে পারে। কয়েকভাবে এই দাবিকে ভুল প্রমাণিত করা যেতে পারে; কিন্তু আমরা এই দাবির বিরোধিতায় কয়েকটি বিষয় বলব, যাতে ব্রিটিশদের মিথ্যা দাবি এবং ভুল বোঝানোর বিষয়টি সবার সামনে পরিষ্কার হয়—

ব্রিটিশদের হাতে হিন্দুস্তানের চারিত্রিক ধ্বংসের ইতিবৃত্ত

চারিত্রিক অধঃপতনের কিছু কারণ

প্রথমত, যেসব ব্রিটিশ হিন্দুস্তানে বেশি আসা-যাওয়া করত বা যাদের হাতে হিন্দুস্তানের ক্ষমতা ছিল, তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের অপদস্থ, নিকৃষ্ট ও খারাপ চরিত্রের অধিকারী ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন, যারা এখানে সব ধরনের খারাপ-অশ্লীল কাজ ইচ্ছা করেই করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ ধরনের বাছাই করেই কোম্পানির ডাইরেক্টর নিয়োগ দিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিচালক ও কর্মচারীদের ব্যাপারে মাদ্রাজের বড় পাদরির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি।[১৪০]

১৬০০ খ্রিষ্টাব্দেও যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে হিন্দুস্তানে ব্যবসার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, তখনও তাদের রেজুলেশনের একটি ধারা ছিল, তাদের ব্যবসায়িক পলিসিতে উপদেষ্টা হিসেবে যেন কোনো ভালো মানুষ না রাখা হয়।[১৪১]

ওপরের আলোচনার দ্বারা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট, ইংল্যান্ডের বদমাশ, গুন্ডা, চোর-ডাকাত লোকদেরই হিন্দুস্তানে আনা হতো। এসব লোকদের নেতৃত্বের কারণে যেই ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হবে, তা চিল কল্পনার বাইরে। ইংল্যান্ডের যেসব লোক অন্যায়-অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না—এই চোর-বদমাশদের সংস্পর্শে তাদের মধ্যেও সম্পদের লোভ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। শাস্তির পরোয়া না করে তারাও কঠিন থেকে কঠিন অপরাধে লিপ্ত হয়ে যেত। ওয়ার্ল্ড হেস্টিংস বলেন—ইংরেজরা হিন্দুস্তানে এসে একদম নতুন মানুষ হয়ে যায়; এসব অপরাধের কথা তারা নিজ দেশে কল্পনাও করতে পারত না। এখানে এসে সেসব অপরাধ করে তাদের অন্তরে শাস্তির ভয় পর্যন্ত আসত না।[১৪২]

এই হেস্টিংসই অত্যন্ত নির্মমভাবে কঠিন হস্তে রোহিলাখণ্ডের মানুষদের সামান্য সম্পদের লোভে অযোধ্যার নবাবের সাথে যুদ্ধে লাগিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইংল্যান্ডে তার বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল সেখান থেকেই তার স্বরূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। কিন্তু এ ধরনের নির্মম ও কঠিন অত্যাচার সত্ত্বেও ব্রিটিশরা তার

---

১৪০. ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কে কদীম কাগাজাত পৃষ্ঠা-৭০

১৪১. তারিখে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা-২৩

১৪২. ইলমুল মায়েশাত : পৃষ্ঠা-৫৮৯

শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের ইতিবৃত্ত

ইংরেজরা ভয় পেয়ে গেল, যদি হিন্দুস্তানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়, তাহলে হয়তো আমাদের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য তারা শিক্ষাদান কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দিলো এবং ১৮৩৮ সালে সব ওয়াকফকৃত জমি সরকারিভাবে কবজা নিয়ে নিল। স্যার উইলিয়াম লেখেন—

জেনারেল স্মিথ কে.সি.ভি সাহেবকে একবার প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি কোনোভাবে এ কাজ করতে পারেন যে, এখানকার স্থানীয়রা নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে একবারে অজ্ঞ থাকবে?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—আমার ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো উপমা নেই, যেখানে অল্প কিছু মানুষ ছয় কোটি মানুষের এলাকায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে; যাকে আজকাল আমরা বাদশাহি বলে থাকি। সুতরাং যেখানে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার প্রভাবে সেখানে তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় বিভেদ দূর হয়ে যাবে। মূলত এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের শাসনকার্য এ দেশ টিকিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ, হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা); সুতরাং শিক্ষার প্রভাবে অবশ্যই মানুষের হৃদয় প্রশস্ত হয় এবং তারা নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে।[১৬৫]

সুতরাং ব্রিটিশরা যখন হিন্দুস্তানের শিক্ষা ও শিক্ষাদান কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দিলো—তাদের মূল টার্গেট যেহেতু অধিক সম্পদ আত্মসাৎ করা ছিল—পরে তারা হিন্দুস্তানে শিক্ষাদানকে নিজেদের উদ্দেশ্যের বিপরীত জিনিস বলে আখ্যায়িত করল। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই যখন শিক্ষাখাত ধ্বংস হয়ে গেল, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিও প্রতিষ্ঠা করা হলো না, যারা শিক্ষিত মানুষ ছিল, তারাও ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করল, তখন হিন্দুস্তানের চতুর্দিকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার যুগ শুরু হয়ে গেল। সে হিসেবে ১৮২৩ সালে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের সামনে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়, যার মূল কথা ছিল—

> সারকথা হলো, আমরা হিন্দুস্তানের মানুষদের মেধাকে শুষ্ক করে দিয়েছি। আমাদের বিজয় এত বিস্ময়কর, তারা শুধু নিজেদের জ্ঞানগত উন্নতির আগ্রহ ও সব উপায়-উপকরণ ধ্বংস করে ফেলেছে সেটাই নয়; বরং অবস্থা এতটাই করুণ, এ দেশের মানুষের মৌলিক জ্ঞানটুকুও বিলুপ্তির পথে। এখানকার লোকদের মেধা-প্রতিভা একেবারেই ধ্বংস

[১৬৫]. খোশহালিয়ে বারতানাবীয়ে হিন্দ : পৃষ্ঠা-১০৯

সাম্প্রদায়িকতার প্রচার-প্রসার

শিক্ষিত-অশিক্ষিত-বুদ্ধিমান সকলের কাছেই সর্বজনস্বীকৃত একটা বিষয় হলো, ঐক্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও পরস্পর মিলেমিশে থাকাই মানুষের কল্যাণ, সফলতা ও দ্বীনি-দুনিয়াবি উন্নতি, শান্তি ও আরামের মাধ্যম। মানুষ মাত্রই বুদ্ধিমান এবং সম্মানের অধিকারী। সে যদি ঐক্য ও আত্মমর্যাদাবোধ অনুভব করে, তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, এটা এমন এক গুণ, যা জংলি জানোয়ার, পশু-পাখির মধ্যেও পাওয়া যায়। তারা তো পারস্পরিক শক্তিমত্তা নিয়ে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। তাদের মধ্যেও সম্প্রীতি পাওয়া যায়। এ কথা অনস্বীকার্য, ঝগড়াঝাঁটি, লড়াই, একে অন্যের থেকে পালিয়ে বেড়ানো, শত্রুতা, অন্যের সম্মান নষ্ট করা এগুলো ধ্বংসের বড় কারণ। কোনোভাবেই এগুলোর অনুমতি দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বার্থান্বেষিতা, নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে, পৃথিবীর সব জাতিকে এমন অভিশপ্ত পলিসি গ্রহণে বাধ্য করে, যার কারণে অসংখ্য জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। ইউরোপিয়ানরা বিশেষভাবে ব্রিটিশরা নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা এবং শোষণের হাতিয়ার হিসেবে এই পলিসিকে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলোর ওপর প্রয়োগ করা আবশ্যক মনে করেছে। যার অভিশপ্ত ফলাফল ছিল হিন্দুস্তান দখল করে নেওয়া। পুরো দেশকে নিজেদের আয়ত্তে এনে, পদদলিত করে, তাদের রক্ত চুষতে থাকা ইংল্যান্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যখন নিজেদের উদ্দেশ্যের মধ্যেই এমন ভয়াবহ ইচ্ছা লুকায়িত থাকে, তখন দেশ ধ্বংসের ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে কী? কিন্তু হায়েনাদের এ চিন্তা করে কী লাভ? তারা তো এসেছেই উপমহাদেশের রক্তচোষার জন্য। শিকার জীবিত থাকুক বা মরে যাক, তাতে তাদের কী? দুই শ বছরের লজ্জাজনক শাসনব্যবস্থা হিন্দুস্তানকে কঠিন ধ্বংস ও দারিদ্র্যের গর্তে ফেলে দিয়েছে। আমাদের এমন-সব খারাপ কাজে লিপ্ত করেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেগুলো সংশোধনের কোনো সুযোগ আমরা পাইনি। আমি সংক্ষিপ্তভাবে ইংরেজদের সেসব ভয়ংকর পলিসি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যার মাধ্যমে সহমর্মিতা, মানবতা ও তাদের সৃষ্টিসেবার মুখোশ খুলে যায় এবং বাস্তবতা উদ্ভাসিত হয়।

সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি এবং ঘৃণার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করা

স্যার জন মেকলাম বলেন—

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
ইসলামি আকিদা – ইলিয়াস ঘুম্মান
কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ
বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান – মুহাম্মাদ সালমান মানসুরপুরি